ইউনিট-১

ভূগোল: একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভূগোল: একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই ইউনিটে আপনি মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন। যেমন-

সংজ্ঞা ও বিষয় পরিধি; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; মানব কর্মকান্ড; মানবের বৃত্তি ও আবাস; এবং মানবের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্ক। এই বিষয়গুলি এখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাঠের মাধ্যমে আলোচিত হবে। এগুলি মানবিক ভূগোলের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

পাঠ-১.১: *মানবিক ভূগোল: সংজ্ঞা ও পরিধি*

পাঠ-১.২: *মানবিক ভূগোল: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য*

পাঠ-১.৩: *মানব কর্মকান্ড*

পাঠ-১.৪: *মানব বসতি এবং আবাস*

পাঠ-১.৫: *পরিবেশ : প্রাকৃতিক*

পাঠ-১.৬: *পরিবেশ : সামাজিক*

পাঠ-১.১ মানবিক ভূগোল: সংজ্ঞা ও পরিধি

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মানবিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও পরিধি; এবং
- মানবিক ভূগোলের প্রধান শাখাসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মানবিক ভূগোল, ভূগোল শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সংজ্ঞাগত ভাবে আমরা বলতে পারি ভূগোলের যে শাখায় মানব গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের অবস্থান, বৈশিষ্ট্য, বিন্যাস, বিবর্তন, চলাচল ও অভিগমন, বসত, জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মকান্ড সম্পর্কে রীতিবদ্ধ পর্যালোচনা করা হয় তাকে মানবিক বা মানব বিষয়ক ভূগোল (Human Geography) বলা হয়।

ভূগোলের অন্তর্নিহিত দার্শনিক যুক্তি বিষয়টিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছে:

ক) প্রাকৃতিক ভূগোল;

খ) মানবিক ভূগোল; এবং

গ) পদ্ধতিগত ভূগোল।

কিন্তু এই বিভাগগুলির মধ্যে গভীর অন্ত:সম্পর্ক রয়েছে যা পরিবেশে'র এক সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ। এই কারণে ফরাসী ভূগোলবিদ ফ্যাসিল ভ্যাল্লোঁ (১৯৩২) মানবিক ভূগোলকে ভূ-পৃষ্ঠের সাথে মানব সমাজের সম্পর্কের একটি সমন্বিত পঠন হিসাবে সঞ্চায়িত করেছেন। প্রাকৃতিক ভূগোলের মত মানব বা মানবিক ভূগোলের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯ শতকে প্রধানত: জার্মানী ও ফ্রান্সে। ফ্রেডারিক র‍্যাটজেল (১৮৪৪-১৯০৪) ১৮৮২ সালে তাঁর এ্যানথ্রোপজিওগ্রাফী গ্রন্থের প্রথম খন্ড এবং ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন। এই সময়কালের মধ্যে তিনি 'মানব জাতির ইতিহাস' রচনা করেন। এই দুইটি গ্রন্থ প্রকান্তরে মানবিক ভূগোলের ভিত্তি হিসাবে পরবর্তীতে গ্রহণ করা হয়। জার্মান ভূগোলবিদ আলফ্রেড হেটনার (১৮৫৯-১৯৪১) ভূগোলকে পৃথিবী পৃষ্ঠের এলাকাগত তারতম্য ব্যাখ্যাকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ সম্পর্কে মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা চিহ্নিত করতে ১৯০৫ সালে ভূগোলে 'পদ্ধতিগত' উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেন। এতে ভূগোলে পদ্ধতিগত ব্যাখ্যার বিকাশ ঘটতে থাকে। র‍্যাটজেল ও হেটনার উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়তিবাদ (Physical Determinism) মতে বিশ্বাস ছিলেন। এই মতবাদের ভিত্তি ছিল যে প্রকৃতি মানুষের কর্মকান্ড, আচরণ ইত্যাদি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

ফরাসী ভূগোলবিদ ভিদাল-দ্য-লা-ব্লাশ (১৮৪৫-১৯১৮) ভূগোলে আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ ধারণাও পোষণ করেন যে, প্রকৃতি মানুষের কর্মকান্ড নিরূপণে সম্ভাবনা তুলে ধরে। মানুষ নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি বা অবস্থানের আওতায় সর্বোত্তম সম্ভাবনাময় কর্মকান্ডটি গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্ভাব্যতাবাদ (Possibilism) মতবাদ বলে। ইউরোপে মানবিক ভূগোলের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় জ্যাঁ ব্রুনে'র ১৯১২ সালে প্রকাশিত 'মানব ভূগোল' গ্রন্থের মাধ্যমে। ব্রুনের মতে ভূগোলবিদগণ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছেন। ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপাদান হিসাবে মানুষের ভূমিকা কখনই স্থির বা স্থৈতিক (Static) ছিল না। লক্ষণীয় যে পরবর্তিতে হেটনার এবং ব্রুনে আমেরিকান ভূগোলবিদদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

ফলে এই প্রভাব এলেন সেম্পল, হান্টিংটন প্রমুখ ভূগোলবিদদের মানিবিক ভূগোল সংক্রান্ত চর্চায় যথেষ্ট প্রকাশ পায়। ১৯৮০'র দশকে মানবিক ভূগোলের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে যেখানে এই শাখা বলতে প্রাকৃতিক ভূগোল বা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পদ্ধতিগত ভূগোল (যেমন, মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি) ব্যতীত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশেষিকরণ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবিক ভূগোলের প্রধান প্রশাখা হিসাবে সাংস্কৃতিক ভূগোল, সামাজিক ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল, জনপদ বা বসত ভূগোল, নগর ও গ্রামীন ভূগোল ইত্যাদি পরিচিত লাভ করে। ভূগোল শাস্ত্রের সামগ্রীক বিকাশের সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর বন্টন পঠনে মানবিক ভূগোলেরও ত্রিমুখী পারিসরিক (Spatial) বিশ্লেষণের বিকাশ ঘটে, অর্থাৎ:

ক) মানবগোষ্টির বা জনসংখ্যার আয়তন/ সংখ্যা, ইহার বৈশিষ্ট্য এবং কর্মকান্ড (Spatial);

খ) জনসংখ্যা-পরিবেশ সম্পর্ক বিশ্লেষণে বাস্তব (Ecological) দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, অর্থাৎ মানুষ-জীবজগৎ সম্পর্ক; এবং

গ) আঞ্চলিক (Regional) বিশ্লেষণ যা নাকি পূর্বোক্ত দুইটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটায়-অর্থাৎ এলাকাগত পার্থক্য (Areal Differentiation) নির্দেশ করে।

বিষয় পরিধি:

সংজ্ঞা আলোচনাকালে দেখা গেছে যে মানবিক ভূগোল, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ ও তদসংক্রান্ত বিষয়াদির রীতিবদ্ধ পর্যালোচনা করে থাকে। মানবিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তু জনগোষ্ঠী ও তাদের কর্মকান্ড/কর্ম পরিমন্ডলের বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে পরিব্যাপ্ত। এগুলোর প্রাসঙ্গিক বিষয় সমূহ হচ্ছে:

১। জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও বন্টন ধারা;

২। জনগোষ্ঠীর কাঠামো, বিন্যাস বিবর্তন/হ্রাস-বৃদ্ধি এবং স্থান সংকুলান;

৩। জনগোষ্ঠীর চলাচল এবং অভিগমন;

৪। জনবসত, গৃহায়ন, বসত-অবকাঠামো, শ্রেণী বিন্যাস, বন্টন এবং পরিকল্পনা;

৫। মানব সমাজ ও সংস্কৃতি, সংস্কৃতি বিস্তার এবং অঞ্চলগত পার্থক্য;

৬। জন প্রশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ভূ-রাজনীতি;

৭। পরিবহন ব্যবস্থা, যাতায়ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য;

৮। উৎপাদন ও উপজীবিকা এবং

৯। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা।

এ সমস্ত মূল বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন শাখা- প্রশাখার বিকাশ ঘটেছে। লক্ষণীয় যে প্রতিটি শাখা-প্রশাখা সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সাথে যেমন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, জনমিতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মানবিক ভূগোলের বিকাশে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

মানবিক ভূগোলের প্রধান শাখাসমূহ

সাংস্কৃতিক বা নৃভূগোল	অর্থনীতিক ভূগোল
ঐতিহাসিক ভূগোল	রাজনৈতিক ভূগোল/ ভূ-রাজনীতি
আঞ্চলিক ভূগোল	সামাজিক ভূগোল
জনসংখ্যা ভূগোল	জনপদ/বসত ভূগোল
নগর ভূগোল	পরিবহন ভূগোল
গ্রামীন ভূগোল	চিকিৎসা ভূগোল
প্রত্ন ভূগোল	কৃষি ভূগোল

বর্তমান বিশ্বে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মানবিক ভূগোলের বিষয় পরিধির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কেননা, মানব বিষয়ক পারিসরিক, বাস্তব এবং আঞ্চলিক তাৎপর্য উদঘাটনে মানবগোষ্ঠী ও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যাবে সাথে সাথে এদের বন্টন ধারা পরিবর্তন বা বিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ ধারা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অবস্থান বিন্যাস বন্টন চিহ্নিত করণ এবং পর্যালোচনা মানবিক ভূগোল অধ্যায়ণের মূল বিষয়।

পাঠসংক্ষেপ:

এই পাঠে আমরা প্রধানত মানবিক ভূগোলের সংজ্ঞা এবং বিষয় পরিধি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। এই পর্যালোচনায় ভূগোলের প্রধান শ্রেনীভাগ প্রাসঙ্গিকভাবে চলে এসেছে। কেননা এর সাথে মানবিক ভূগোলের বিকাশ ধারা সংশ্লিষ্ট। আবার মানবিক ভূগোলের বিকাশ ধারা আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মানে বেশ কিছু পাশ্চাত্য ভূগোলবিদদের নাম ও সময়কাল চলে এসেছে। সমসাময়িককালে মানবিক ভূগোলের বিষয়বস্তু পঠন-পাঠনে তিনটি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়। এগুলি হলো: পারিসরিক, বাস্তব্য এবং আঞ্চলিক। এই ত্রিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় মানবিক ভূগোলের বিষয় পরিধির বিকাশ ঘটেছে। এরই ফলশ্রুতিতে মানবিক ভূগোলের বেশ কিছু নির্দিষ্ট শাখারও বিকাশ ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ফরাসী ভূগোলবিদ ফ্যাসিল ভ্যাল্লোঁ (১৯৩২) মানবিক ভূগোলকে ভূ-পৃষ্ঠের সাথে ---- সমাজের সম্পর্কের একটি সমন্বিত পঠন হিসাবে সঞ্চায়িত করেছেন।

১.২. মানব বা মানবিক ভূগোলের সূত্রপাত ঘটেছিল ---- শতকে প্রধানত: জার্মানী ও ফ্রান্সে।

১.৩. ফ্রেডারিক র‍্যাটজেল (১৮৪৪-১৯০৪) ---- সালে তাঁর 'এ্যানথ্রোপজিওগ্রাফী' গ্রন্থের প্রথম খন্ড এবং ---- সালে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন।

১.৪. র‍্যাটজেল ও ---- উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়তিবাদ (Physical Determinism) মতে বিশ্বাস ছিলেন।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. মানুষ নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি বা অবস্থানের আওতায় সর্বোত্তম সম্ভাবনাময় কর্মকান্ডটি গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্ভাব্যতাবাদ (Possibilism) মতবাদ বলে।

২.২. ১৯৮০'র দশকে মানবিক ভূগোলের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

২.৩. মানবিক ভূগোলের বিকাশে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তেমন কোন প্রভাব নেই।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মানবিক ভূগোলের সংজ্ঞা দিন।

২. মানবিক ভূগোলের ভিত্তি হিসাবে কি কি গ্রন্থ রচিত হয়?

৩. মানবিক ভূগোলের বিকাশ ধারা আলোচনা করুন।

৪. সমসাময়িককালে মানবিক ভূগোলের ধারা নির্দেশ করুন।

৫. মানবিক ভূগোলের বিকাশের সাথে সাথে কি কি শাখা/ বিষয়ের উৎপত্তি ঘটেছে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মানবিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।

পাঠ-১.২ মানবিক ভূগোল: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মানবিক ভূগোলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পারিসরিক, বাস্তব্য এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূ-পৃষ্ঠে পরিবেশের সাথে মানুষ এবং মানুষের কর্মকান্ডের আন্ত:সম্পর্ক উদঘাটন মানবিক ভূগোলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পরিপূরক মানবিক ভূগোলে সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতি রয়েছে। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা মানব কর্মকান্ডের বৈশিষ্ট্য ও ধারা উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করাই মানবিক ভূগোলের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

নিম্নে বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১। **পর্যবেক্ষণ:** পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়। পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহের প্রধান ও প্রাথমিক উৎস। ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট এলাকা সরাসরি পর্যবেক্ষণের দ্বারা তথ্যাদি সংগৃহিত হতে পারে। এ ছাড়া মানচিত্র, আলোকচিত্র এবং দূর অনুধাবন তথ্য (যেমন, বিমান চিত্র এবং উপগ্রহ চিত্র) ব্যবহার করেও ভূ-পৃষ্ঠে মানব কর্মকান্ড এবং পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

২। **সমীক্ষা:** নির্দিষ্ট উপাদান সহযোগে পর্যবেক্ষিত বৈশিষ্ট্যের যথার্থতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সমীক্ষা বা গবেষণার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানবিক ভূগোলের বিষয়াদি সমীক্ষার জন্য কোন ক্ষুদ্র এলাকাকে গবেষণাগার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে এই এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা কৌশল অবলম্বন করা যায়।

৩। **মূল্যায়ণ:** সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিক ব্যাখ্যামূলক এবং পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির প্রয়োগ তথ্য মূল্যায়ণের অপরিহার্য উপায়। বর্তমানে এই মূল্যায়নে বিভিন্ন কম্পিউটার পদ্ধতি, যেমন, জি, আই, এস (GIS)-এর ব্যবহারের ব্যাপকতা লাভ করছে। মূল্যায়ণের ফলে তথ্য যাচাইকরণ বিষয়টি সহজ হয়ে পড়ে এবং তথ্যগত ভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক হয়।

৪। **মানচিত্রায়ণ:** মানচিত্রায়ণ মানবিক ভূগোল তথা ভূগোল শাস্ত্রের বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। তথ্য মানচিত্রায়নের ফলে নির্দিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বিশেষ করে মানব কর্মকান্ডের উপাদানসমূহের বিন্যাস (Pattern), বন্টন (Distribution) এবং আঞ্চলিকরণ (Regionalization) ব্যাখ্যা সহজতর হয়। অনেকসময় এই মানচিত্রায়নের সাথে দূর অনুধাবন তথ্য সংযোগ করে মানুষ পরিবেশ সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাত্রা উন্নীত করা যায়।

৫। **মডেল প্রণয়ন:** বিশ্লেষণভিত্তিক তত্ত্ব উপস্থাপন অথবা মডেল নির্মাণ মানবিক ভূগোলে তথ্য বিশ্লেষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মডেল তত্ত্বের সরলীকৃত রূপ। প্রকৃত কথায় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বাস্তবতার সরলীকৃত ব্যাখ্যামূলক ধারণা হচ্ছে মডেল। আবার দীর্ঘকাল ও বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত মডেল তত্ত্বে রূপ লাভ করে।

উপরে বর্ণিত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠে মানব-পরিবেশ সম্পর্ক বিশ্লেষণ মানবিক ভূগোলের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠসংক্ষেপ:

পারিসরিক, বাস্তব্য এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূ-পৃষ্ঠে পরিবেশের সাথে মানুষ ও মানুষের কর্মকান্ডের আন্ত:সম্পর্ক উদঘাটন মানবিক ভূগোলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ অনুসরণ করা হয়। এই পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠে মানব-পরিবেশ সম্পর্ক বিশ্লেষণ মানবিক ভূগোলের প্রধান লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. পারিসরিক, বাস্তব্য এবং ---- দৃষ্টিভঙ্গিতে ভূ-পৃষ্ঠে পরিবেশের সাথে মানুষ এবং মানুষের কর্মকান্ডের আন্ত:সম্পর্ক উদঘাটন মানবিক ভূগোলের প্রধান উদ্দেশ্য।

১.২. পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির ---- পর্যায়।

১.৩. মানবিক ভূগোলের বিষয়াদি সমীক্ষার জন্য কোন ---- এলাকাকে গবেষণাগার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

১.৪. মূল্যায়ণের ফলে তথ্য ---- বিষয়টি সহজ হয়ে পড়ে।

১.৫. ---- মানচিত্রায়নের ফলে নির্দিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

১.৬. মডেল ---- সরলীকৃত রূপ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

১. পর্যবেক্ষণ কি?

২. সমীক্ষা কি?

৩. মূল্যায়ন কি?

৪. মানচিত্রায়ন কি?

৫. মডেল প্রণয়ন কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মানবিক ভূগোলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবিক ভূগোলের লক্ষ্য অর্জনে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

পাঠ-১.৩ মানব কর্মকান্ড

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড;
- তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড; এবং
- চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ড সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

মানবিক ভূগোলে মানব কর্মকান্ড বলতে কোন জনগোষ্ঠী বা এলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতিক কর্মকান্ড বুঝায়। জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, হাল-হাতিয়ার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আবাস উপকরণ, ঔষধপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগ প্রভৃতি নানাবিধ পণ্য ও পরিচর্যার প্রয়োজন এবং সেগুলির উৎপাদন (Production), বন্টন (Distribution) এই সমস্ত কর্মকান্ডের মূল্য-বাণিজ্যিক ও সামাজিক উভয়ার্থে রয়েছে। এই কর্মকান্ডের পরিধি ব্যাপক এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকার বা পেশা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যে কর্মের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাগত বৈশিষ্ট্য পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মকান্ডের প্রকৃতি বা ধরণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, মানুষের পেশা বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী হতে পারে। একটি শিল্পোন্নত দেশে প্রায় ১০,০০০ এরও বেশী বিভিন্ন পেশা রয়েছে। সম্ভাবত এত বিপুল সংখ্যক পেশার শ্রেণী বিভাগ এবং পর্যালোচনা করা সহজসাধ্য নয়। তবে পেশা যেহেতু সামগ্রিক কর্মের বা কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে শ্রেনীভাজন সম্ভব। সুতরাং সহজপন্থা হিসাবে মানুষের অর্থনীতিক কর্মকান্ডকে সাধারণত: পর্যায়মূলক চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড (Primary Activities);
২। মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড (Secondary Activities);
৩। তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড (Tertiary Activities); এবং
৪। চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ড (Quarterrary Activities)

প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড

প্রধানত: প্রকৃতি নির্ভর কর্মকান্ডকে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড বলে। এই পর্যায়ের কর্মকান্ডে তেমন শিল্প ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না-ও হতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ সাধারণত ঘটেনা। এই কারণে একে মানুষের মৌলিক কর্মকান্ডও বলা হয়ে থাকে।

এই কর্মকান্ডের মধ্যে:

- সংগ্রহ (Gathering), যেমন, প্রাকৃতিক অরণ্য বা ভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ মৎস্য আহরণ এবং পশু শিকার;
- পশুচারণ (Herding) যেমন, প্রাকৃতিকভাবে পশুপালন;
- কৃষিকার্য (Agriculture) যেমন কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রধানত খাদ্যশষ্য; এবং
- উত্তোলন (Extraction) যেমন, খনন কাজের মাধ্যমে নুড়ি, বালি এমন কি খনিজ দ্রব্য আহরণ।

প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ডে জড়িত প্রধান পেশাজীবী হচ্ছে কৃষক, মৎস্যজীবি , শিকারী, কাঠুরিয়া খনি শ্রমিক, পশুপালন, মধু বা বনজ দ্রব্য সংগ্রাহক প্রভৃতি। একারণে পেশা ভিত্তিক বা কার্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়:

- কৃষি: খাদ্যশষ্য এবং অর্থকরী শষ্য;
- মৎস্য আহরণ: মিঠাপানি এবং লোনাপানির মৎস্য আহরণ;
- অরণ্য ও বনজ দ্রব্য আহরণ: কাঠ ও ওষুধী এবং মধূ ইত্যাদি সংগ্রহ;
- পশুপালন: দুগ্ধজাত পণ্য এবং পশু দ্রব্য উৎপাদন ; এবং
- খনিজ দ্রব্য আহরণ: খনন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন খনিজ (কয়লা, তেল ও গ্যাস) উত্তোলন।

অনেক সময় পশুপালনকে কৃষি কর্মকান্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিভাবিজনের প্রতিটির একাধিক শ্রেণীভাগ রয়েছে । নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে স্থান ও কালভেদে এই শ্রেণীবিভাজন হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশ্ব কৃষির নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাজন করা যায় (চিত্র ১.১.১)

সারণী-১.৩.১

কৃষির শ্রেণীবিভাজন	বৈশিষ্ট্য	প্রধান অঞ্চল/দেশ	উৎপাদিত পণ্য
১। স্বয়ংভোগী কৃষি	নিজ চাহিদা পূরণ ও উদ্বৃত্তবিহীন উৎপাদন।	দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও কতিপয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র।	ধান, ভূট্টা ও অন্যান্য স্থানীয় খাদ্য শস্য।
২। চক্কর কৃষি	পাহাড়ী ঢালে পানি সেচ সমন্বয়কারী।	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চল।	প্রধানত ধান।
৩। নিবিড় শুষ্ক কৃষি	৪০''র নিচে বৃষ্টিপাত, নিবিড় সেচ ভিত্তিক।	মধ্য এশিয়া, প্রধানত: চীন ও মঙ্গোলিয়া।	প্রধানত ধান, ভুট্টা এবং যব।
৪। উপনিবিষ্ট কৃষি	আর্দ্র বিষুবীয় অঞ্চল, ঔপনিবেশিক শাসনামল প্রচলিত বাণিজ্যিক কৃষি।	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ক্যারিবিয় অঞ্চল,প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চল।	চা, কফি, রবার, ইক্ষু, কলা, বাদাম, এবং আনারস।
৫। চারণ বৃত্তিক যাযাবর কৃষি	পশুপালন এবং মৌসুমী অভিগমন ধারা।	উত্তর ইরান, উত্তর ইরাক, পূর্ব তুরস্ক মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকা।	মেষ এবং ছাগল পালন।
৬। বাণিজ্যিক পশুপালন (র‍্যানচিং)	বৃহদায়তন বাণিজ্যিক পুঁজি ভিত্তিক গোবাদি পশু পালন।	মধ্য যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।	মানব উৎপাদনের জন্য গরু ও মেষ পালন।
৭। বাণিজ্যিক কৃষি	বৃহদায়তন বাণিজ্যিক পুঁজি ভিত্তিক শস্যচাষ।	যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা, রাশিয়া ও ইউক্রেইন।	গম, ধান, যব, তুলা।
৮। উদ্যান ও শস্য কৃষি	স্বল্পায়তন বাণিজ্যিক ও নিবিড় পুঁজিভিত্তিক চাষাবাদ।	ইউরোপীয় দেশসমূহ বিশেষ করে নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী।	গম, আঙ্গুর, আপেল, শাক-সবজী।
৯। মিশ্র কৃষি	স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদ	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র	গম, ভুট্টা, ফলমূল, শাক-সবজী।
১০। উদ্যান কৃষি	বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক, যেমন শহর বা লোকালয়ের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিকাজ।	বিশ্বের প্রায় সকল বড় নগর-বন্দর সন্নিহিত এলাকায় বিশেষায়িত কৃষি।	তাজা শাক-সবজী, ফল এবং টাটকা ফলমূল।

চিত্র-১.৩.১: বিশ্ব কৃষি ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন (সংখ্যাসমূহ পাঠ্যবর্ণিত শ্রেণীবিভাজনসূচক)। চিহ্নিত এলাকা প্রধানত: কৃষিকার্যবিহীন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড

মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ডের ওপর নির্ভরশীল এবং পরিবর্ধিত রূপমাত্র। এই পর্যায়ে প্রাথমিক কর্মকান্ড দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। এই উৎকর্ষ সাধন প্রধানত: দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। ফলে দ্রব্যের গুনগত মানই পরিবর্তন হয় না, ইহার ভৌত পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য যেমন, তুলা থেকে বয়ন শিল্প প্রক্রিয়ার ফলে বস্ত্র, আকরিক লৌহ থেকে ইস্পাত, ইক্ষু থেকে চিনি ইত্যাদি। মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পেশা হচ্ছে শিল্প শ্রমিক এবং শিল্প উৎপাদন সম্পর্কীয় সকল পেশা।

সারণী- ১.৩.২

মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড: প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান
১। শিল্প উৎপাদন: ভারী ও হাল্কা শিল্প।
(ক) ভারী শিল্প : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প,
প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (রেল ও জাহাজ নির্মাণ),
মটরগাড়ী ও উড়োজাহাজ নির্মাণ,
ভারী রসায়ন শিল্প (অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন)
(খ) হাল্কা শিল্প :
বস্ত্র বয়ন শিল্প,
রসায়ন ও ঔষধ শিল্প,
খাদ্য ও পানীয় শিল্প,
ইলেকট্রনিক্স শিল্প,
খেলনা ও বিনোদন দ্রব্য নির্মান।
২। বিশ্বের প্রধান শিল্পাঞ্চল :
(ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ; দক্ষিণ-মধ্য ইউরোপ, উরাল-মস্কো এলাকা;
(খ) দক্ষিণ জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব চীন, তাইওয়ান;
(গ) উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র;
(ঘ) অন্যান্য এলাকা: কোরিয়া ও ভারত।

কাঁচামালের প্রাপ্তি ও অনুকূল ভৌগোলিক এবং অর্থনীতিক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্বের কতিপয় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। সাধারণভাবে শিল্প অবস্থানের নিয়ামকগুলি হলো: ভূমির প্রাপ্যতা, কাঁচামাল ও শ্রমিকের সরবরাহ, পুঁজি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার। এ ছাড়া সরকারী পর্যায়ে প্রশাসনিক নীতিমালা অনেক সময় সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড:

প্রধানত মাধ্যমিক এবং অনেক সময় প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল কর্মকান্ডকে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্যাদির (যদি উদ্বৃত থাকে) বাজারজাতকরণের মাধ্যম সমূহ এবং এর জন্য পুঁজি, বিনিয়োগ, বীমা, ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা ও সম্পর্কীয় সেবা সমূহ এই পর্যায়ের কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত। মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়, পরিবহন ও পরিচর্যামূলক কর্ম তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড হিসাবে পরিগণিত। এই পর্যায়ের প্রধান কার্যাবলীকে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়:

- সেবা বা পরিচর্যামূলক;
- বাণিজ্যিক; এবং
- অর্থ ব্যবস্থাপনা।

সারণী- ১.৩.৩ : তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের শ্রেণীভাগ

কার্যাবলী	প্রতিষ্ঠান	অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য
ক) সেবা বা পরিচর্যামূলক		
বিনোদনমূলক	নাট্যশালা, সিনেমা, পার্ক, স্টেডিয়াম, রেস্তোরাঁ, চিড়িয়াখানা, চিত্রশালা।	ক্রেতা বা ভোগকারীদের অবস্থানের নিকট, পরিব্রাজক পথে এবং বহু ভোগকারীদের চাহিদার পরিপূরক।
বৃত্তিমূলক	হোটেল, মোটেল, পেট্রোল পাম্প, অবসর কেন্দ্র ইত্যাদি।	প্রাকৃতিক যা মানবসৃষ্ট লোকালয় থেকে দূরে সহজসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পন্ন।
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	চিকিৎসাকেন্দ্র, নিরাময় কেন্দ্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক।	জনবসত বা নগরকেন্দ্রে সহজসাধ্য যাতায়াত ব্যবস্থার নিকটবর্তী।
ব্যক্তিগত পরিচর্যামূলক	স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, উপাসনালয়।	নির্দিষ্ট জনসংখ্যার চাহিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সুগম্যস্থানে অবস্থান।
জন প্রশাসন	জন প্রশাসন, বিচার, প্রশাসনিক সুবিধাদি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা।	ব্যক্তিগত পরিচর্যামূলকের ন্যায় তবে গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন পূরণ করে।
ব্যবসা মেরামতি সেবা	প্রচারণা, বিভিন্ন দ্রব্যের মেরামত ও বিক্রয় সেবা।	বিশেষায়িত ক্রেতা/ ব্যবহারকারীদের পরিচর্যাকেন্দ্রিক। লোকালয় ও কেন্দ্রিয় বাজার ভিত্তিক অবস্থান।

কার্যাবলী	প্রতিষ্ঠান	অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য
খ) বাণিজ্য :		
খুচরা ব্যবসা	পেট্রোল পাম্প, মুদি দোকান, ঔষধের দোকান, লন্ড্রী বৃহদায়তন শপিং কমপ্লেক্স, গাড়ী, সাইকেল দোকান ইত্যাদি।	বিভিন্ন ধরণের ক্রেতা আকৃষ্টকারী ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ক্রেতা- চাহিদা দ্বারা সমন্বিত। বিভিন্ন শ্রেণীর দোকানের অবস্থান নির্ধারিত এবং জনপদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।
পাইকারী ব্যবসা	বৃহদায়তন আড়ৎ, গুদামজাত দ্রব্যাদির সমাহার।	ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনবসত এলাকা, তবে সাধারণ ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নাও হতে পারে।
যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা	যানবাহন এবং যাতায়াত কেন্দ্র, বাস/ রেল স্টেশন, সকল প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ডাক ও তার ব্যবস্থা।	জনগোষ্ঠীর নিয়মিত সেবা গ্রহণ, জনবসত এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রের নিকটবর্তী অবস্থান।
গ) অর্থ ব্যবস্থাপনা :		
ব্যাংক	স্থানীয়/ শাখা ব্যাংক, মুদ্রা পরিবর্তনকারী সেবা প্রতিষ্ঠান।	বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং লোকালয়ের নিকট ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত।
বীমা	বীমা অফিস এবং বীমা প্রতিনিধির তৎপরতা।	ব্যাংক-এর অনুরূপ।
ভূমি বাজারজাত প্রতিষ্ঠান	ভূমি লেনদেন অফিস এবং প্রতিনিধির তৎপরতা।	ক্রেতার অবস্থান ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। চাহিদা অনুযায়ী সেবার পর্যায় নির্ভরশীল।

এই পর্যায়ে গুরুতপূর্ণ পেশা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের বিক্রেতা, পরিবহন কর্মী, প্রশাসনিক কর্মী, ব্যবস্থাপক, ব্যাংকার, বীমাকর্মী এবং অন্যান্য পরিচর্যামূলক সেবা প্রদানকারী কর্মী।

চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ড:

পর্যায়মূলক কর্মকান্ডের দ্বারা মানুষের কার্যাবলীর সামগ্রীক ধরন চিহ্নিত হলেও এমন বহু কর্মক্ষেত্র রয়েছে যে গুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে অথবা সুনির্দিষ্টভাবে পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এগুলির মধ্যে শিক্ষালাভ (ছাত্রত্ব), রাজনীতিকদের কর্মকান্ড, আইন বিষয়ক পরামর্শদান বা মামলা পরিচালনা, কবি ও লেখকদের সাহিত্যকর্ম, শিল্পীর অংকন কর্ম, দার্শনিকের দর্শনকর্ম, সংগীত শিল্পীর সঙ্গীত সৃষ্টি, পেশাদার খেলোয়াড় বা শরীর চর্চাবিদ, ধর্মীয় মজলিসে পেশাদার ওয়াজকারী

ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় যে, এ সমস্ত প্রতিটি কর্মের সৃজনশীলতা রয়েছে। সমাজে এগুলির চাহিদা রয়েছে এবং সমাজ গঠনে বিভিন্নভাবে এই সমস্ত কর্মের আর্থিক ও সামাজিক মূল্য রয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত বেশ কিছু কর্মকান্ডের ফলে সুদূর প্রসারী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে যা পরিশেষে অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ কবি নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান, কামরুল হাসানের চিত্র কর্ম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক বক্তব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্পী পাবলো পিকাসোর যুদ্ধ বিরোধী চিত্র্য 'গুয়ের্নিকা' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভৎসতার তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে মানুষের মনে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। তেমনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রিঙ্গো স্টার ও জর্জ হ্যারিসন (বিট্‌লস্ সদস্য) এর সঙ্গীত বাঙ্গালীদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখে। এই সমস্ত কর্মকান্ডের আপাত দৃষ্টিতে সরাসরি দ্রব্যমূল্য বা অর্থ মূল্য দৃশ্যমান হয় না। ফলে অনেকের দৃষ্টিতে এগুলির ব্যবহারগত ভিত্তি সুস্পষ্ট হয় না। এই ধরনের কর্মকান্ডকে চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রধানত : শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী প্রভৃতি পেশাজীবিগণ চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ডভুক্ত।

পাঠসংক্ষেপ:

মানব কর্মকান্ড প্রধানত: চার শ্রেণীভুক্ত: প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড, মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড, তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড এবং চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ড। এই সমস্ত কর্মকান্ডে অন্তর্ভূক্তি হিসাবে মানুষের পেশার মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা দেখা যায় এবং এই ভিন্নতার সামগ্রীক বিশ্ব আঞ্চলিক ধারাও দেখা যায়। তথ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য বিশ্ব বা আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার কর্মকান্ডের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। তবে সামগ্রীকভাবে পৃথিবীর উন্নত অঞ্চলে মোট শ্রম শক্তির প্রায় ১০ শতাংশ কৃষি বা প্রাথমিক কর্মকান্ড, ৪০ শতাংশ মাধ্যমিক এবং ৫০ শতাংশ তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত বলে ধরা যায়। উন্নয়নশীল অঞ্চল এই হার যথাক্রমে ৫০, ১০, এবং ৪০ শতাংশ। তবে কিছু কিছু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে (যেমন, জাপান, সিঙ্গাপুর, আরব আমিরাত, মালদ্বীপ ইত্যাদি) কৃষিভূমির স্বল্পতার জন্য এই হার প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক কর্মকান্ডে যুক্ত জনসংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০ শতাংশ, তৃতীয় পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ এবং মাত্র ক্ষুদ্র অংশ চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. মানবিক ভূগোলে মানুষের কর্মকান্ড বলতে কোন জনগোষ্ঠী বা এলাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ---- কর্মকান্ড বুঝায়।

১.২. প্রধানতঃ প্রকৃতি নির্ভর কর্মকান্ডকে ---- পর্যায়ের কর্মকান্ড বলে।

১.৩. প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ডকে ----- কর্মকান্ডও বলা হয়ে থাকে।

১.৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড ----- পর্যায়ের কর্মকান্ডের ওপর নির্ভরশীল এবং ----- রূপমাত্র।

১.৫. মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের ফলে দ্রব্যের গুনগত মানই পরিবর্তন হয় না, ইহার ----- পরিবর্তন ঘটে।

১.৬. প্রধানত মাধ্যমিক এবং অনেক সময় ----- পর্যায়ের কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল কর্মকান্ডকে তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বলা হয়।

১.৭. মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়, পরিবহন ও পরিচর্যামূলক কর্ম ---- পর্যায়ের কর্মকান্ড হিসাবে পরিগণিত।

১.৮. ----- পর্যায়ভুক্ত বেশ কিছু কর্মকান্ডের ফলে সুদূর প্রসারি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরঃ

১. পেশা ও উপজীবিকা কি? এ দু'টির সাথে মানব কর্মকান্ডের সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

২. মানব কর্মকান্ড কাকে বলে? এই কর্মকান্ডের শ্রেণীভাগ করুন।

৩. প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ড কি? দুটি উদাহরন দিন।

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের কর্মকাণ্ড কি? দুটি উদাহরন দিন।

৫. তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড কি? দুটি উদাহরন দিন।

৬. চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড কি? দুটি উদাহরন দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. প্রাথমিক কর্মকান্ড বলতে কি বুঝেন? উদাহরনসহ আলোচনা করুন।

২. মাধ্যমিক কর্মকান্ড সমন্ধে আলোচনা করুন।

৩. তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের পূর্ণ আলোচনা করুন।

৪. উদাহরণ সহকারে চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকান্ড আলোচনা করুন।

৫. প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে কি কোন যোগসূত্র বা আন্তঃসম্পর্ক আছে? এই সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-১.৪ মানব বসতি এবং আবাস

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মানব বসতি এবং আবাস;
- বসতির সংজ্ঞা এবং দৃষ্টিভঙ্গি;
- বসতির বিবিধ সংজ্ঞা;
- বসতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ; এবং
- জলবায়ুভেদে বিশ্ব জনবসতির বিন্যাস সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে বসতির অনুশীলন মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তন পরিবেশ অর্থনীতিক কর্মকান্ড এবং প্রযুক্তি পর্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আলোচ্য পাঠে আমরা এ সমস্তের সামগ্রিক আঙ্গিকে মানব বসতি বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ, বসতির শ্রেণীভাগ এবং বিশেষ করে গ্রামীন বসতির ধরণ পর্যালোচনা করা হবে।

বসতির সংজ্ঞা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

ভূগোলবিদ স্মিথ (১৯৬০) তাঁর 'ভৌগোলিক অভিধান'- এ বসতি বলতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য তৈরী মানুষের আবাসস্থল বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে একক আবাস স্থল থেকে গ্রাম, এমন কি মহানগরীয় আওতায় পড়বে। ষ্টোন (১৯৬৫)-এর মতে কোন স্থানে এক বা একাধিক মানুষের বসবাস করাকে বসতি বলে। ফরাসী ভূগোলবিদ ব্রুনে (১৯৪৭)-এর মতে মানুষের দুটি মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ বসতগৃহ ও রাজপথের ভূ-পৃষ্ঠে বহি:প্রকাশ হল বসতি। ডিকেন্স ও পিট (১৯৬৩) বলেন, ক্ষুদ্র গ্রাম, শহর ও নগরে মানুষ ও আবাস স্থলের সমষ্টি হল বসতি। বুকানন বসতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'বসতি অর্থে এক বা একাধিক নির্মান এবং আবাসিক জমি,পথ-ঘাট, পার্ক বা বাগান হিসেবে ব্যবহৃত খোলা জায়গাসহ এসকল নির্মানের সঙ্গে সংশিষ্ট সকল প্রকার কাঠামোকে বুঝায়। বহুবিধ গঠন, আকার, আকার

বসতির বিবিধ স্তর

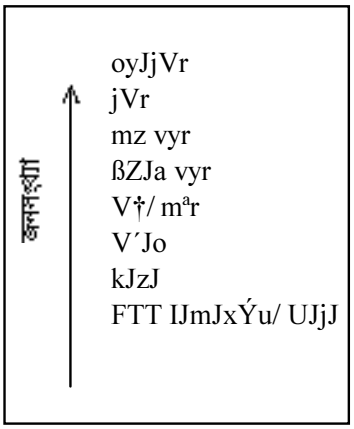

এবং ক্রিয়াকলাপসমূহ এর অন্তর্গত। এটি গ্রামাঞ্চলের এক নি:সঙ্গ আবাস অথবা লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি নগরকেও বুঝতে পারে। একটি স্বতন্ত্র নির্মান কত বৃহৎ অথবা কত জটিল তা যাই হোক না কেন এর উদ্ভব হয়েছে শীত-বৃষ্টি ও হিংস্র প্রাণীর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আদিম মানুষের নড়বড়ে আচ্ছাদন থেকে। অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, স্থপতি, এবং ভূগোলবিদ স্ব স্ব শাস্ত্রের পরিস্থিতি বসতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু ভূগোলবিদ বসতিকে 'স্থানিক সংগঠন' হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্পর্কে বর্ধিত আলোচনা ইউনিট ৬-এ করা হয়েছে বিধায় এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

বসতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ : ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে বসতির চর্চাকে সনাতনী, সাংখ্যিক এবং আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। বসতির অবস্থানজনিত কারণ হিসাবে সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কমূলক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বসতির শ্রেণীবিভাজন করা হয় বসতিস্থানের বৈশিষ্ট্যাবলী অনুসারে। যেমন, গঞ্জ-শহর, বন্দর-শহর, কুমার-পাড়া, জেলে-গ্রাম ইত্যাদি।

সাংখ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বসতিসমূহের ব্যবধান এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন থেকে লব্ধ ধারণা ও নীতিমালাকে বাস্তবের সরলীকরণ 'মডেল' হিসাবে রূপদান করে। খৃষ্টলার, বারজেস, হয়েট, হ্যারিস-উলম্যান এর তত্ত্বসমূহ উল্লেখযোগ্য (ইউনিট-৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপন্ন করে যে, মানুষের কার্যাবলী কেবল শর্তহীনভাবে যুক্তির সীমানায় গন্ডিবদ্ধ করে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ মানবকর্ম সম্পর্ক প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের 'ফিল্টার' দিয়ে পরিসৃতকৃত মাপকাঠির সাহায্যে পরিবেশকে প্রত্যয়ন করার ক্ষমতার দ্বারা। এ জন্য প্রয়োজন একাধিক সম্পর্কিত দৃষ্টিকোনের মিথস্ক্রিয়ার গভীর বিশ্লেষণ।

বসতি বিশ্লেষণে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্যণীয় যে বিশ্ব পর্যায়ে বিশেষ করে জলবায়ুগত বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন ধরণের বসতি নির্মিত হয়েছে। এখন এই দৃষ্টিকোন বিশ্ব বসতির বিন্যাস আলোচনা করা হবে।

জলবায়ুভেদে বিশ্ব জনবসতির বিন্যাস

জলবায়ু প্রধানত মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। এ কারণে জলবায়ুভেদে মানব বসতির পার্থক্য ভূগোলবিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জীবনধারণ এবং আশ্রয়ের জন্য মানুষ এমন কিছু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিনিয়তই তাকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছে। আবার প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য উপকরণও সে গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেছে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে স্বায়িত্ব ও বৈচিত্র্য অনুসারে নির্দিষ্ট জলবায়ুতে পৃথিবীর মানব বসতিসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের বসতি: নিরক্ষীয় অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ নিরক্ষীয় উদ্ভিজ্জপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য এরা নিরক্ষীয় অরণ্যের বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। অরণ্যে ডাল-পালা, কাঠ দিয়ে দেয়াল এবং তাল জাতীয় পাতা বা লম্বা ঘাস ও অনেক সময় ধানগাছের কান্ডাংশ দিয়ে বাড়ীর ছাদ বা চালা বানায়। বন্য জন্তু বা সরীসৃপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন অঞ্চলে (যেমন পাহাড়ী অরণ্যভূমিতে) মাটি থেকে কিছুটা উপরে মাচার উপর বাড়ী তৈরী হয়। এসমস্ত বাড়ী নির্মাণে কাঠ ও বাঁশের ব্যবহার ব্যাপক। মালয়েশিয়ার সেমাং, বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহে, মায়ানমারের আরাকান ও কারেন এলাকায়, শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা সম্প্রদায় এবং আমাজন অববাহিকায় মাচার উপর বাড়ী ঘর তৈরীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিস্তীর্ন নিরক্ষীয় সমভূমি অঞ্চলে ভূমির উপর

সামান্য উচু মাটির পাটাতনের ঘর বাড়ী থেকে শুরু করে পাকা বহুতল গৃহ তৈরী হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এরূপ বসতি বহুল প্রচলিত।

লক্ষণীয় যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধিকাংশ বসতি পানির উৎসের নিকটে নির্মিত হয়েছে। এই উৎস নদী বা পাহাড়ী ঝর্ণা এবং কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক জলাশয়ে বা খননকৃত পুকুর এই ভূমিকা পালন করেছে। অধিকাংশ ঘর-বাড়ীর দেয়াল বাঁশ বা ঘাসের দ্বারা নির্মিত এবং এক বা একাধিক কুঠুরী/ কামরা থাকতে পারে। তবে আফ্রিকার অধিকাংশ আদিবাসীরা গাছের ডাল দিয়ে ছোট ছোট গোলাকার কুঁড়েঘর তৈরী করে গোত্র হিসাবে গুচ্ছাকার বসতি নির্মাণ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে সমগ্র নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘর বাড়ী নির্মাণে টিনের ছাউনি ও কোন কোন স্থানে দেয়াল নির্মানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের প্রবণতা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবল। এর কারণ প্রধানত বসতির নির্মান উপাদানের স্থায়ীত্ব ছাড়াও প্রাকৃতিক উপাদানের অভাব উল্লেখযোগ্য। আর প্রাকৃতিক উপাদানের অভাবের প্রধান কারণ হলো বর্তমান শতাব্দীতে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি এবং খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য ক্রম বর্ধমান হারে অরণ্যভূমি ধ্বংস। বসতি বিকাশের জন্যও একইভাবে বনভূমি উজাড় হচ্ছে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হওয়ার কারণে বসতি বিন্যাস ও ঘন সন্নিবেশিত এবং কখনও সংঘবদ্ধ ও গুচ্ছকার।

উষ্ণ মরু অঞ্চলের বসতি: এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত চারণ বৃত্তিক যাযাবর। পশুপালন মৌসুমী চারণ এলাকা বা তৃণভূমি প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নির্দিষ্ট গন্ডিতে প্রতিবছর এদের আবাসস্থল স্থানান্তরিত হয়। এজন্য এরা প্রধানত তাঁবুতে বসবাস করে। তাঁবুগুলি চামড়া দিয়ে তৈরী। মধ্য এশিয়া, উত্তর ইরান, উত্তর ইরাক, পূর্ব তুরস্ক এবং উত্তর আফ্রিকার বসতিগুলি এই ধরণের। তবে আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে বুশম্যান ও অন্যান্য আদিবাসীরা কাঁটাগাছের সাহায্যে তৈরী অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে। অপরদিকে, পশ্চিম এশিয়ার মরু প্রায় অঞ্চলের তাঁবু-বসতির মধ্যে গৃহসজ্জা ও অভিজাত্যের পরিচয় মেলে। এই অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হওয়ার এর প্রধান কারণ। এঁদের তাঁবুগুলি চামড়া অথবা ক্যানভাসের তৈরী। দেয়াল ও মেঝেতে উৎকৃষ্ট কার্পেটের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এই তাঁবু বসতিগুলি সমসাময়িক আরাম-আয়েশের উপকরণে সজ্জিত। অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত মরুবাসীদের মধ্যে বেদুইন সম্প্রদায় এখনও চারণবৃত্তিক যাযাবর শ্রেণীর। এদের তাঁবু বসতিগুলি আরাম-আয়েশের উপকরণ সজ্জিত। অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্তবান এখনও চারণ বৃত্তিক। এঁদের তাঁবু অবয়ব ও মরুসজ্জা তাদের অর্থনীতিক অবস্থান নির্দেশ করে।

মরু অঞ্চলের স্থায়ী বসত এলাকা, যেমন, ইরান, ইরাক, ইয়ামেন, আরব আমিরাত এবং দক্ষিণ সৌদি আরবে মাটির তৈরি ঘর বাড়ীর প্রচলন আদিকাল থেকে রয়েছে। ঘর-বাড়ী গুলি শীতল রাখার জন্য অতি উচ্চ জানালা, কুলুঙ্গী এবং বাতাস টাওয়ার নির্মাণের প্রচলন রয়েছে। সাম্প্রতিককালে একাধিক পশ্চিম এশিয়া দেশসমূহে যাযাবরদের স্থায়ী বসত স্থাপনের সরকারী উদ্যোগ লক্ষণীয়। এই সমস্ত বসতগুলি পাকা, প্রধানত একতলা। ইট-সিমেন্ট ছাড়া কাঠের ব্যবহার উল্লেখ করার মত। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি স্থায়ী বসতে মসজিদের অবস্থান এই সমস্ত আবাসস্থলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে কোন কোন অঞ্চলে, যেমন ইরান, ইয়ামেন, বাহরাইন এবং দক্ষিণ আমেরিকার মরু অঞ্চলে নল-খাগড়া ও মাটির তৈরী সমতল ছাদযুক্ত বাড়ী লক্ষণীয়। এ সমস্ত বসতের অধিবাসীগণ যাযাবর নয় স্থায়ী আবাসে কৃষি এবং বানিজ্যে এদের অভ্যস্ততা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হওয়ার জন্য এই জলবায়ু অঞ্চলের বসতির ধরণ বিক্ষিপ্ত এবং সাধারণত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বসতি : উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তরাংশে অরণ্য পরিবেশে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। বাসগৃহ প্রধানত: কাঠের গুড়ি বা তকতা নির্মিত দেয়াল এবং কাঠের পাটাতনসহ মসৃণ পাথর বা টালির ছাদযুক্ত। অর্থনীতিক কারণ এবং সহজলভ্যতা বলেই এই ধরণের উপকরণ ব্যবহার হয়। তবে এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কাঠের বদলে পাথর বা পোড়া ইট নির্মাণকাজে অধিক ব্যবহার হয়। ইটালী, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস, তিউনিস, আলজেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় সবত্রই এইসব উপকরণ নির্মিত বসত দেখা যায়।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বসতির বিন্যাস প্রধানত অর্থনীতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রধানত সড়কপথ বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রৈখিক বা গুচ্ছাকার ধরণের মানব বসতি গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষণীয়।

মেরু অঞ্চলের বসতি : মেরু অঞ্চলের ইনুইট্দের ঋতুভেদে বিভিন্ন ধরণের বসতবাড়ী নির্মাণ কৌশল দেখা যায়। খাদ্য সংগ্রহের জন্য সমুদ্র উপকূলবাসী ইনুইট্সরা বাতাস প্রতিরোধী খাড়ি বা ভূগু এলাকায় বসত গড়ে থাকে। এ ধরণের স্থানে গ্রীষ্মকালে তারা ঘাসের চাপড়া, মস, কাঠের গুড়ি বা তকতার দেয়াল এবং চামড়া আচ্ছাদিত বসতবাড়ী তৈরী করে। বসতবাড়ীগুলি উল্টানো ত্রিভূজ বা গম্বুজাকার হয়ে থাকে। প্রতিটিতে প্রধানত একটি প্রবেশ পথ থাকে।

অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ সমতল এলাকায় বরফের চাপড়া দিয়ে নির্মিত গম্বুজাকার একমুখি ঘর তৈরী করে। এ গুলিকে 'ইগলু' বলে। তবে বর্তমানে ইগলু নির্মণের প্রচলন কমে আসছে। ইনুইট্সরা আমেরিকান সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কাঠ নির্মিত গুচ্ছকার বসতি গড়ে তুলছে। আলাস্কা অঞ্চলে এ ধরণের লোকালয়ের প্রাধাণ্য রয়েছে। বসতির বিন্যাস প্রধানত বিক্ষিপ্ত এবং যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল।

পাঠসংক্ষেপ:

উপরে বিশ্বের প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে বসতি ধারার সরলীকৃত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এতে পরিবেশগত বাধ্য-বাধকতা বসত বিন্যাসে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলা যায়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই চারটি অঞ্চলের নগর এলাকার পরিকল্পিত বসত এলাকায় সম্পূর্ণ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর আবাস গড়ে ওঠেছে। এই সব এলাকায় জলবায়ু বা পরিবেশগত বাধ্য-বাধকতার চাইতে অর্থনীতিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রশাসনিক গুরুত্ব প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করেছে।

ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা এদের 'এস্কিমো' নামে অভিহিত করতো। এস্কিমো অর্থ 'মানুষসম'-শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহার হত। বর্তমানে 'ইনুইটস' অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দটি প্রচলিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. ভূগোলবিদ স্মিথ (১৯৬০) তাঁর ---- এ বসতি বলতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তৈরী আবাসস্থল বুঝিয়েছেন।

১.২. ষ্টোন (১৯৬৫)-এর মতে কোন ---- এক বা একাধিক মানুষের বসবাস করাকে বসতি বলে।

১.৩. ভূগোলবিদ বসতিকে ---- হিসাবে বিশ্লেষন করেছেন।

১.৪. ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে বসতির চর্চাকে সনাতনী, সাংখ্যিক এবং ----।

১.৫. ----- বসতিসমূহের ব্যবধান এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন থেকে লব্ধ ধারণা ও নীতিমালাকে বাস্তবের সরলীকরণ 'মডেল' হিসাবে রূপদান করে।

১.৬. ---- প্রতিপন্ন করে যে, মানুষের কার্যাবলী কেবল শর্তহীনভাবে যুক্তির সীমানায় গন্ডিবদ্ধ করে ব্যাখ্যা করা যায় না।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন:

২.১. জলবায়ু প্রধানত মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলে।

২.২. জীবনধারণ এবং আশ্রয়ের জন্য মানুষ এমন কিছু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিনিয়তই তাকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছে।

২.৩. নিরক্ষীয় অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ নিরক্ষীয় উদ্ভিজ্জপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে।

২.৪. লক্ষণীয় যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধিকাংশ বসতি পানির উৎসের নিকটে নির্মিত হয়েছে।

২.৫. উষ্ণ মরু অঞ্চলের বসতি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত চারণ বৃত্তিক যাযাবর।

২.৬. অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত মরুবাসীদের মধ্যে বেদুইন সম্প্রদায় এখনও চারণবৃত্তিক যাযাবর শ্রেণীর।

২.৭. উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দক্ষিণে অরণ্য পরিবেশে মানব বসতি গড়ে উঠেছে।

২.৮. মেরু অঞ্চলের বসতবাড়ীগুলি উল্টানো ত্রিভূজ বা গম্বুজাকার হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বসতির সংজ্ঞা দিন।

২. মানব বসতির সাধারন মানানুক্রমতা লিখুন।

৩. বসতির দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ কি কি?

৪. কিসের ভিত্তিতে মানব বসতি সমূহকে ভাগ করা হয়েছে?

৫. মানব বসতি সমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মানব বসতের সংজ্ঞা দিন এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

২. জলবায়ুভেদে বিশ্ব জনবসতের বিন্যাস আলোচনা করুন।

পাঠ-১.৫ পরিবেশ : প্রাকৃতিক

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্বাচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান;
- ভূমি বন্ধুরতা সম্বন্ধে; এবং
- পর্বত ও সমভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূ-মন্ডলের যে অবস্থা, শক্তি এবং বস্তুসমূহের সামগ্রিক জীব-জগৎকে তথা মানুষকে প্রভাবিত করে তাই পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)। পক্ষান্তরে, মানুষের যে কর্মকান্ড ভূ-মন্ডলের অবস্থা, শক্তি এবং বস্তুসমূহকে প্রভাবিত করে তাকে সাংস্কৃতিক (Cultural) বা সামাজিক পরিবেশ (Social or Human Environment) বলে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে যৌথভাবে ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographic Environment) বলা যেতে পারে। মানুষের কার্যাবলী তথা প্রযুক্তি, ঐতিহ্য, আচরণগত ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান বা সে বংশ পরম্পরায় বহন এবং লালন করে, নিজে শেখে এবং অপরকে শেখায় তা প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক পরিবেশের ফলাফল।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু যেমন, ভূমির বন্ধুরতা, পানি, বায়ু, উদ্ভিজ, মৃত্তিকা প্রভৃতির সমন্বয় যা মানুষের কর্মকান্ড ও আচার-আচারণ প্রভাবিত করে তাকে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বলে। আদিমযুগেও একমাত্র প্রকৃতির উপর মানুষ নির্ভরশীল ছিল। অরণ্য, নদী-নালা বা জলাশয় থেকে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত। তারপর সে পশু শিকার শিখল, আরও পরে শিখল কৃষিকাজ ও পশুপালন। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানুষের সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশের বিবর্তন ঘটছে এবং মানুষের কার্যাবলী প্রাকৃতিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করছে। উদাহরণ স্বরূপ, যান্ত্রিক যানবাহনের আবিষ্কারের ফলে মানুষ দূরত্ব জয় করেছে, আবহাওয়াগত প্রতিকূল অবস্থাকেও সে প্রযুক্তির সাহায্যে সহনশীল করে নিজের আওতায় এনেছে। এই পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া মানুষের সভ্যতার সাথে চলমান এবং পরিবর্তনশীল। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনভাবেই নিষ্ক্রিয় নয়। মানুষ এবং মানুষের কর্মকান্ডের প্রতিভূসমূহ ব্যতীত একটি অঞ্চলে যা কিছু বিদ্যমান তার সব কিছুই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। এখানে নির্বাচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ভূমি বন্ধুরতা: ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতার তারতম্য অত্যধিক। এর ফলে বিভিন্ন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে বিশাল উচ্চ ভূমি–

- পাহাড় পর্বত এবং গভীর নিম্নভূমি

- নদী-নালা,হ্রদ, জলাশয় (বিল, হাওর ইত্যাদি) থেকে গভীর সমুদ্র উল্লেখযোগ্য। এরূপ অঞ্চলসমূহের ধরণ অনুযায়ী মানুষের কার্যাবলীর পার্থক্য দেখা যায়।

সমূদ্র উপকূল রেখা স্থল ও জলের সংযোগস্থল। এই উপকূলরেখা মানুষের কর্মকান্ড ও প্রতিবন্ধকতা

-উভয় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত ও সংযোগ, সমুদ্র ভিত্তিক আর্থনীতিক কর্মকান্ড -মৎস্য আহরণ থেকে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নগর ও বন্দরের বিকাশ সবই সমুদ্র উপকূল ভিত্তিক দেখা যায়।

অভগ্ন উপকূল রেখা অপেক্ষা ভগ্ন উপকূলরেখা অনেক বেশী সুবিধাজনক। কারণ ভগ্ন উপকূল পোতাশ্রয় ও বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে সুবিধাজনক। সুইডেন, যুক্তরাজ্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে, ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানত অভগ্ন উপকূল রেখার মাত্র সীমিত সংখ্যক নৌবন্দর গড়ে ওঠেছে। অপর দিকে উপকূল ভূমি পর্বতময় হলে বন্দর ও পশ্চাদভূমির যোগাযোগ দূরহ হয়ে পড়ে। ব্রাজিলের তীরভূমি এই অসুবিধার সম্মুখীন। অন্যত্র যেমন, জাপান এবং চীনে প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ এই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছে।

পর্বত ও সমভূমি: পর্বত ও সমভূমিতে মানুষের কর্মকান্ডের পার্থক্য সর্বাধিক। মানুষের আদি এবং বর্তমানে বহুল প্রচলিত কৃষিকার্য প্রধানত: সমভূমিতেই সাধিত হয়। এছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অধিকাংশ মাধ্যমিক এবং তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বিশেষ করে পানি-শক্তি, পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল থেকে হয়ে থাকে। এছাড়া পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ লোক সমভূমিতে বাস করে। রাস্তা-ঘাট, জলপথ এবং রেলপথের প্রসার প্রধানত সমভূমিতে দ্রুত ঘটে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-সংস্থানে অসমতল মৃত্তিকার আস্তরণ অগভীর, ও কাকরময় হয়। পানি ধারণ ক্ষমতা পার্বত্য অঞ্চলে কম। ফলে এ অঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রবণতা অনুকূলে নয়। তবে পার্বত্য অঞ্চলের ঢালে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মে। এই সমস্ত বৃক্ষের বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট। অপেক্ষাকৃত অনুকূল জলবায়ুতে পাহাড়ী ঢালে বেশ কিছু অর্থকরী ফসল উপনিবিষ্ট কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যেমন, চা, কফি, রবার, বাদাম, জলপাই, আঙ্গুর ইত্যাদি। যে সকল স্থানে পাহাড়ের ঢাল অপেক্ষাকৃত খাড়া কিন্তু তৃণময় সেখানে মেষ ও ছাগল পালন সম্ভব। চারণ বৃত্তিকা যাযাবরগণ এই পালন পেশায় যুক্ত।

নদী ও হ্রদ : প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের খাদ্য আহরণের জন্য নদী ও হ্রদ উৎকৃষ্ট স্থান। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে, মানুষের প্রধান পেশা মৎস্য শিকার। এ ছাড়া নদী ও হ্রদ সহজ ও অপেক্ষাকৃত সস্তা যাতায়াত পথ হিসাবে বিবেচিত। মানুষের প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে নদী ও হ্রদ কৃষির সহায়ক পানি সেচের উৎস হিসাবে কাজ করে। নদীকে ভিত্তি করে বাঁধ নির্মান করে পৃথিবীর অনেক দেশে যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ইত্যাদি ব্যাপক জলসেচ, নালা নির্মিত হয়েছে এবং ফলে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নদী অনেক সময় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যাতায়াত পথে এই বাধা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নিরসন সম্ভব। কিন্তু নদীবহুল দেশে, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, চীনে, অস্বাভাবিক বন্যা ব্যাপক ভাবে কৃষি, আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান, জনবসতির ক্ষয় ক্ষতি সৃষ্টি করে থাকে। এক্ষেত্রে এই দুর্যোগের উপর মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

জলবায়ু: জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি প্রধান উপাদান এবং মানুষের কর্মকান্ডকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। মানব কর্মকান্ডের প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড কৃষিকাজের উপর এর প্রভাব সর্বাধিক। জলবায়ু কর্ষণ উপযোগী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে। আমরা জানি যে, অতি চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, যেমন- অতি উষ্ণ যথা শুষ্ক মরু অঞ্চলে এবং অতি শীতল-বরফময় যথা মেরু অঞ্চলে কৃষি কাজের জন্য উপযোগী নয়। আবার কোন অঞ্চলে কি ধরণের চাষাবাদ হবে তা জলবায়ুর

মাত্রা ও ধরণ নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, আর্দ্র বিষুবীয় অঞ্চল ধান চাষের জন্য উপযোগী। গম চাষের জন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল উপযোগী। অন্যান্য ফসলের ঋতুভিত্তিক বপন কালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই কৃষি কর্মকান্ডের উপর জলবায়ুর প্রভাব সহজ প্রত্যক্ষ করা যায়। চাষাবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানব বসতের উপর জলবায়ুর প্রভাব আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি।

শিল্প অবস্থানের উপর জলবায়ুর বেশ প্রভাব রয়েছে। যেমন, তুলাবয়ন শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। আটা-ময়দা শিল্পের জন্য শুষ্ক জলবায়ু, চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সূর্য করজ্জোল জলবায়ু খুবই প্রয়োজন। যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবস্থাও জলবায়ু দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত। মরু ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রবায়ু এবং নিয়ত বায়ুপ্রবাহ নৌযানের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতো। এখনোও সমুদ্রপথগুলি ঝঞ্জাবহুল বিষুবীয় অঞ্চল পরিহার করে চলে।

মানুষের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সামর্থ জলবায়ু দ্বারা অনেকাংশ নিয়ন্ত্রিত। বেশ কিছু মহামারী রোগ যেমন, কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া আর্দ্র নিরপেক্ষীয় অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ঠিক তেমনি টি. বি. ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমনিয়া ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত রোগ শীত প্রধান অঞ্চলে স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। অপরদিকে, জলবায়ু অবস্থার কারণে বন্যা, নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল, ভূমি ধ্বস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানব কর্মকান্ড, উৎপাদন এবং সভ্যতাকে সর্বকালে প্রভাবিত করেছে। তবে জলবায়ুগত অনেক প্রতিক্রিয়া মানুষ প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে।

উদ্ভিজ: উদ্ভিজ্জের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কর্মকান্ডও পরিবর্তন হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের গভীর অরণ্য কাঠ-চেরাই, রবার সংগ্রহ ও বনজ দ্রব্যাদি এবং ফলমূল আহরণ ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য প্রধানত: অনুপযোগী। এরূপ অঞ্চলে কাঠ যেমন শক্ত বৃদ্ধিও তেমন দ্রুত। ফলে ভূমি পরিস্কার করে অন্যান্য কর্মকান্ড, বিশেষ করে কৃষিকাজ সহজসাধ্য নয়। অপরদিকে, এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাপদ সঙ্কুল হওয়াতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বসত খুবই কম। পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা কিছু নমনীয় হওয়ার কারণে নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ অরণ্যে কাঠ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে এবং অনেক স্থানে এই শিল্পের উপর নির্ভর করে জনবসত গড়ে উঠেছে।

কৃষিকাজ ও বাণিজ্যিক পশুপালনের জন্য নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল বিখ্যাত। বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা, সুষম বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলকে গম, ভুট্টা ও বিবিধ ফলমূল চাষের জন্য উপযোগী করে তুলেছে। অপরদিকে পর্যাপ্ত তৃণভূমির জন্য এই অঞ্চল পশুপালনের জন্য বিখ্যাত। মরু অঞ্চল প্রধানত বৃক্ষ শূণ্য। স্থানীয় কাঁটাজাতীয় গুল্ম ও ঝোপ-ঝাড় কৃষিকাজের জন্য উপযোগী নয়। তবে যেখানে তৃণভূমি রয়েছে সেখানে চারণ বৃত্তিক যাযাবরদের পশুপালন দেখা যায়।

উপরোক্ত অবস্থাসত্ত্বেও মানুষ যেখানে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জের ধ্বংস সাধন করেছে সেখানে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অঞ্চলের তৃণভূমির অংশ বিশেষ ধ্বংস করায় সেখানে ভূমি ধ্বংস, মৃত্তিকাক্ষয় এবং বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয় দেশসমূহের উজানে হিমালয় পাদদেশীয় এলাকায় প্রাকৃতিক অরণ্য নিধনের ফলে নিম্ন অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে চকরিয়া-কক্সবাজার উপকূলে গরাণ অরণ্য ধ্বংস করে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ করায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেখানে জনবসতি সমুদ্র ঝঞ্জা থেকে রক্ষা প্রাপ্তির জন্য বনভূমির অভাবে প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

মৃত্তিকা: কৃষিকাজে মৃত্তিকার প্রভাব অত্যাধিক। যে স্থানে মৃত্তিকা উর্বর বা উর্বর করা সম্ভব কেবল সে স্থানেই চাষাবাদ সম্ভব। অনুর্বর মৃত্তিকা সম্পন্ন এলাকায় অন্যান্য অনুকূল উপাদান থাকা সত্ত্বেও সন্তোষজনক চাষাবাদ সম্ভব নয়। বিশ্বের অধিকাংশ পার্বত্য এলাকা এইরূপ। অপরদিকে মৃত্তিকার ধরণের উপর কি ফসল উৎপন্ন হবে তা অনেকটা নির্ভর করে। সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ততা ভূমি বা লোহিত মৃত্তিকা চাষের জন্য অনুকূল নয়। আবার মৃত্তিকা সহজে প্রবেশ্য না হলে পানি সঞ্চালন ও গাছের বা ফসলের শিকড় প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে পার্বত্য অঞ্চলে ও উচ্চ মালভূমি চাষাবাদের জন্য সুবিধাজনক নয়। মরু অঞ্চলের ক্ষারযুক্ত বালিমাটিও চাষাবাদের অনুকূল নয়। নদী অববাহিকার পলি মাটি ও দোঁ-আশ মাটি কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী।

উপরে বর্নিত প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়াও কোন স্থানের অবস্থান, অপরাপর স্থান হতে দূরত্ব, গম্যতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তদানুযায়ী মানুষের কর্মকান্ড প্রভাবিত হতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ:

প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু যেমন, ভূমির বন্ধুরতা, জলবায়ু, উদ্ভিজ, মৃত্তিকা প্রভৃতির সমন্বয় যা মানুষের কর্মকান্ড ও আচার-আচারণ প্রভাবিত করে তাকে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' বলে। আদিমযুগেও একমাত্র প্রকৃতির উপর মানুষ নির্ভরশীল ছিল। অরণ্য, নদী-নালা বা জলাশয় থেকে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত। তারপর সে পশু শিকার শিখল, আরও পরে শিখল কৃষিকাজ ও পশুপালন। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবদ্ধকতা সত্ত্বেও মানুষের সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশের বিবর্তন ঘটছে এবং মানুষের কার্যাবলী প্রাকৃতিক পরিবেশকেও প্রভাবিত করছে। উদাহরণ স্বরূপ, যান্ত্রিক যানবাহনের আবিষ্কারের ফলে মানুষ দূরত্ব জয় করেছে, আবহাওয়াগত প্রতিকূল অবস্থাকেও সে প্রযুক্তির সাহায্যে সহনশীল করে নিজের আওতায় এনেছে। এই পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া মানুষের সভ্যতার সাথে চলমান এবং পরিবর্তনশীল। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনভাবেই নিষ্ক্রিয় নয়। মানুষ এবং মানুষের কর্মকান্ডের প্রতিভূসমূহ ব্যতীত একটি অঞ্চলে যা কিছু বিদ্যমান তার সব কিছুই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান। এই পাঠে নির্বাচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ভূ-মন্ডলের যে অবস্থা, শক্তি এবং বস্তুসমূহের সামগ্রিক জীব-জগৎকে তথা মানুষকে প্রভাবিত করে তাই পরিবেশ বা ---- প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment)।

১.২. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে যৌথভাবে ---- (Geographic Environment) বলা যেতে পারে।

১.৩. প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু যেমন ভূমির বন্ধুরতা, পানি, বায়ু, উদ্ভিজ, মৃত্তিকা প্রভৃতির সমন্বয় যা মানুষের কর্মকান্ড ও আচার-আচারণকে প্রভাবিত করে তাকে ---- বলে।

১.৪. সমুদ্র উপকূল রেখা স্থল ও জলের ----।

১.৫. অভগ্ন উপকূল রেখা অপেক্ষা ভগ্ন উপকূলরেখা অনেক বেশী ---- ।

১.৬. পৃথিবীর প্রায় ---- শতাংশ লোক সমভূমিতে বাস করে।

১.৭. নদী অনেক সময় প্রাকৃতিক ---- সৃষ্টি করতে পারে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. পানি ধারণ ক্ষমতা পার্বত্য অঞ্চলে বেশী।

২.২. প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের খাদ্য আহরণের জন্য নদী ও হ্রদ উৎকৃষ্ট স্থান।

২.৩. জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি প্রধান উপাদান।

২.৪. গম চাষের জন্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল উপযোগী।

২.৫. শিল্প অবস্থানের উপর জলবায়ুর প্রভাব নেই।

২.৬. উদ্ভিজ্জের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কর্মকান্ডও পরিবর্তন হয়।

২.৭. কৃষিকাজ ও বাণিজ্যিক পশুপালনের জন্য নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল উপযোগী নয়।

২.৮. কৃষিকাজে মৃত্তিকার প্রভাব অত্যাধিক।

২.৯. মরু অঞ্চলের ক্ষারযুক্ত বালিমাটি চাষাবাদের অনুকূল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

২. প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

পাঠ-১.৬ পরিবেশ: সামাজিক পরিবেশ

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশের সামাজিক অবস্থা; এবং
- প্রাকৃতিক বনাম সামাজিক পরিবেশ, মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

কোন জনগোষ্ঠীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ধর্ম, প্রথা, সংস্কার বা কুসংস্কার, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, শহর-নগর প্রভৃতি মানুষের সৃষ্টি করা উপাদানসমূহের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞানই সংস্কৃতি। নির্দিষ্ট মানব সংস্কৃতি পরিচালিত জ্ঞান ও জীবন যাত্রার বহি:প্রকাশ হলো সামাজিক পরিবেশ।

স্মর্তব্য যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নির্ভর করে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যায় ও তার বোধ শক্তি বা প্রত্যক্ষণের (Perception) ওপর। সংস্কৃতি এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা মানুষের সৃষ্টি। নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে এগুলোই নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের জীবন যাত্রা এবং কর্মকান্ড। এগুলোর আওতায় মানুষ নানাবিধ সম্পদ ব্যবহার করে। মানুষ তার আদি জীবনে ছিল সংগ্রহকারী এবং শিকারী। আদিতে অন্যান্য জীব জন্তুর সাথে মানুষের জীবন যাত্রার বড় বেশী পার্থক্য ছিল না। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তন ও বিকাশের ফলে মানুষের কর্মকান্ড ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

তবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্যের কারণে সব জনগোষ্ঠীর সমরূপ বিবর্তণ ও বিকাশ ঘটে নাই বা সকলে সমানভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে সম্পদ ব্যবহার করতে পারে নাই। আবার কোন কোন জনগোষ্ঠীর এই বিকাশ নির্দিষ্ট পর্যায়ে ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণের ফলেই। এতে প্রকারান্তরে মানুষের সংস্কৃতি ও সমাজ প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ তথা প্রকৃতির সুযোগ গ্রহণ করতে হলে প্রযুক্তিগত দক্ষতা কাজে লাগানো অপরিহার্য। নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর এই দক্ষতা কাজে লাগানো হচ্ছে কি না বা কাজে লাগানোর জন্য প্রযুক্তিগত পর্যায় কি ধরণের তা নির্ভর করে সেই গোষ্ঠীর রাজনীতি, অর্থনীতিক দর্শন, ধর্মীয় চিন্তাধারা, শিক্ষার মান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা সামগ্রিকভাবে তার সামাজিক পরিবেশের ওপর। যে সকল স্থান পাট চাষের উপযোগী নয় সে সকল স্থানে পাট চাষের জন্য প্রচেষ্ঠার পেছনে ভারত ও পাকিস্থানের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পাটজাত কাঁচামালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। মুসলিম দেশসমূহে মদ ও শুকর উৎপাদন না হওয়ার পেছনে রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ। সুতরাং বলা যেতে পারে যে কেবল প্রযুক্তিগত বিদ্যা এবং সঙ্গতিই মানুষের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রথাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

প্রাকৃতিক বনাম সামাজিক পরিবেশ: মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক

প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে না, মানুষও প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে - এই বিতর্ক সমসাময়িক ভূগোল শাস্ত্রের প্রারম্ভ থেকে চলে আসছে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবেশ এবং মানব কর্মকান্ড ও তৎপরতা বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানবজীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। জীবনে কোন পরিবর্তন আসলে তা পরিবেশকে

যেমন পরিবর্তন করে তেমনি পরিবেশের পরিবর্তন মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশ মানুষকে তার জীবিকার পথ নির্দেশ করে এবং মানুষ তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশের সাথে পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথষ্ক্রিয়া ভূগোলবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন, যেমন:

প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ (Physical Determinism);

সম্ভাব্যতাবাদ (Posibilism); এবং

নব্য-নিমিত্তবাদ (Neo-Determinism)

প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ

প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ ১৮-১৯ শতকে বিশেষ গুরত্ব লাভ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে, মানুষের সকল কর্ম তৎপরতা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিকার জন্য এই মতবাদকে প্রাকৃতিক বা পারিবেশিক নিমিত্তবাদ বা নিয়তিবাদ বলা হয়।

এই মতবাদের প্রধান উপাদানসমূহ হলো–

- প্রাকৃতিক পরিবেশের কার্য-কারণ সম্পর্ক;
- শক্তিশালী বাস্তবগত প্রভাব;
- প্রাকৃতিক নির্বাচন; এবং
- সংস্কৃতি ও পরিবেশের মধ্যে অবধারিত সম্পর্ক।

প্রকৃতি মানুষকে কার্যকরণ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন, মরুভূমিতে উষ্ণ ও বিরূপ আবহাওয়ার জন্য যাযাবর জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। একইভাবে প্লাবন ভূমি অঞ্চলে কৃষককূল এবং উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ বসবাস এবং জীবিকা অর্জন করছে।

পরিবেশ মানুষের জীবিকা, পোষাক-পরিচ্ছেদ, তথা মানব সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, মরু অঞ্চলে মানুষ ঢিলা পোষাক পরিধান করে কারণ এরূপ পোষাক আরামপ্রদ, আবার শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা এবং সেলাই করা পোষাক-আশাক ব্যবহৃত হয়। তাতে ঠান্ডা কম লাগে। বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চলে সহজে পানি অপসারণের জন্য উচ্চ ঢালযুক্ত বাড়ীর ছাদ নির্মিত হয়। শূষ্ক মরু অঞ্চলে তার প্রয়োজন হয় না, বরং হাল্কা উপকরণ বা তাঁবু নির্মিত আবাস ব্যবহার হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ডারইউনের মতবাদশ্রয়ী। পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন বৈপরীত্ত ও বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত। যেমন, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে নতি স্বীকার করলে পরিবেশই নিয়ন্ত্রক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

র‍্যাটজেল, সেম্পেল, হান্টিংটন প্রমুখ ভূগোলবিদগণ মনে করেন যে, সংস্কৃতি ও পরিবেশের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এর প্রমান পাওয়া যায় মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং এই প্রচেষ্ঠার প্রতিভূ হিসাবে সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণ বা অভিজ্ঞান নির্মাণ করা। ফলে, উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন জলবায়ু ভেদে বসতবাড়ী, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি তৈরী হয়েছে।

মতবাদসমূহ

মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে যারা প্রাচীনকালে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হিপোক্রেটেস (৪২০ খৃ.পূ.) উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'On Air, Water and Places' নামক গ্রন্থে এশিয়া ও ইউরোপের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মধ্যে বৈপরীত্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পরিবেশগত পার্থক্যের জন্য এই বৈপরীত্য। পার্বত্য ইউরোপের মানুষ লম্বা, ভদ্র ও সাহসী; শুষ্ক অঞ্চলের কৃশ বলিষ্ট ও সাহসী এবং এশিয়ার মানুষের মধ্যে খাটো, কিছুটা খর্বকায় এবং অলস বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। এরিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ খৃ: পূ) তাঁর 'Politics' শীর্ষক গ্রন্থেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, শীত প্রধান উত্তর ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর কর্মশক্তি, কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে, ফলে তারা স্বাধীন হলেও রাজনৈতিক সংগঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারে তারা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে নাই। অন্যদিকে দক্ষিণের গ্রীষ্ম প্রধান এশিয়াবাসীরা বুদ্ধিমান, দক্ষ কিন্তু তাদের কর্মশক্তির অভাবহেতু পরাধীনতা বা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। উপরোক্ত দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী গ্রীকগণ উভয় অঞ্চলের উত্তম গুনাবলীর অধিকারী এবং সেজন্য তারা পৃথিবীর সেরা জাতি। তার স্বাক্ষর দেশ শাসন, ব্যবসা বানিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত। একইভাবে স্ট্রাবো রোমের উত্থান ও গৌরব, ইতালীর আকৃতি, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বোদিন (১৬ শতক) মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, উত্তরাঞ্চলের লোকেরা পাশবিক, বর্বর, নিষ্ঠুর-নৃশংস এবং দু:সাহসিক কাজে উৎসাহী। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিহিংসা পরায়ন, চতুর ও মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করে দেখার ক্ষমতা সম্পন্ন। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপরোক্ত দুই অঞ্চলের থেকে বেশী কম শক্তিপূর্ণ এবং কম-ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

পরবর্তীকালে ফরাসী মানবতাবাদী মঁতেস্কু তাঁর লেখায় মানুষের চরিত্রের উপর জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ দক্ষিণের আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মানুষের চাইতে অধিক শক্তিশালী, সাহসী, মনখোলা, স্থিরসংকল্প এবং কামাতুর। পক্ষান্তরে দক্ষিণের অধিবাসীগণ উদ্দীপনাক্ষন, অলস ও কর্মবিমুখ এবং তারা দ্রুত প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। তিনি আরও বলেন যে, মৃত্তিকার উপর জলবায়ুর প্রভাবের ফলে মাটির অনুর্বরতা মানুষকে দৃঢ়চেতা করে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে, মাটির উর্বরতা ভূস্বামী ও অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং সামুদ্রিক অভিযানের জন্য মহাদেশীয় ভূভাগের অধিবাসীদের চাইতে দ্বীপাঞ্চলের ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী অধিকতর তৎপর। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলির বিশ্বব্যাপী তৎপরতা এর উদাহরণ।

ইম্যানুয়েল কান্ট মানুষের উপর পরিবেশগত প্রভাব দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, নিউইংল্যান্ড উপকূলের অধিবাসীরা অর্ধমুদ্রিত চক্ষুবিশিষ্ট এবং তাদের মাথা পেছনের দিকে না হেলিয়ে বেশী দূরে তাকাতে পারে না। উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা অতিমাত্রায় অলস ও ভীরু। তাদের অলসতা ও ভীরুতা আবার তাদের দলবদ্ধ করেছে। এর ফলে তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী এবং শাসক হিসাবে রাজাদের উপর অতি নির্ভরশীল।

পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯ শতকে মানুষ পরিবেশ সম্পর্ক নির্ণয়ে দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ হচ্ছেন কার্ল রিটার, আলেকজান্ডার ফন হামন্সেবাল্ড, হ্যাকেল, বাকেল, সেম্পল প্রমুখ ভূগোলবিদগণ।

রিটার (১৭৭৯-১৮৫৯) সর্বপ্রথম পরিবেশ সম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন ঘটান। একজন সাবধানী পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি (ক) মানুষের উপর মৃত্তিকার প্রভাব, এবং (খ) মৃত্তিকার উপর মানুষের কার্যকলাপ - উভয়েরই গুরুত্বারোপ করেন। 'Europa' নামক দুই খন্ডের পুস্তকে তিনি উপকূলীয় পরিবেশের প্রভাবের ফলে নিরাপদ সংস্কৃতি বিকাশের ছোট ছোট লালনকেন্দ্র হিসাবে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলির গুরুত্ব তিনি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর মরু পরিবেশের প্রভাবের ফলে তুর্কীদের চোখ সংকীর্ণ এবং চোখের পাতা ভারী।

হামবোল্ড (১৭৬৯-১৮৫৯) অধিকতর বৈজ্ঞানিক রীতিতে মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য একটিমাত্র মতবাদ গঠনে যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন যে, কোন এলাকার প্রাকৃতিক গঠন তথাকার অধিবাসীদের রীতিনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। পার্বত্য এলাকার এবং সমভূমি এলাকার অধিবাসীদের চোখ যথেষ্ট ভিন্নতর নয়। তিনি 'Cosmos' নামক গ্রন্থে এরূপ সুবিচারপূর্ণ বহু মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সমুদ্রের প্রভাবের ফলেই ক্রমশ ফনেসীয়দের এবং পরবর্তীকালে হেলেনিক জাতিসমূহের শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হামবোল্ডের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রিটারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় একই সময়ে লিখিত হলেও হামবোল্ডের চিন্তাধারা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করতে সমর্থ হয়নি। তবে তাঁর মতামতগুলি নিজস্ব গতিবেগ লাভ করেছিল।

হান্টিনটন প্রাকৃতিক পরিবেশের কতিপয় বিশেষ উপাদান (যেমন জলবায়ু, ভূ-রূপ. মৃত্তিকা, খনিজ, উদ্ভিজ, জীবজন্তু) নির্বাচন করেন এবং ঐগুলির প্রত্যেকটি মানুষের সংস্কৃতির উপর কিরূপ শর্তাধীন প্রভাব বিস্তার করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর 'Principles of Human Geography'- গ্রন্থে তিনি এই ধরণের বহু উদাহরণ প্রদান করেছেন। এই পুস্তকে তিনি মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই সম্পর্কের ব্যতিক্রমের কারণ লক্ষ্য করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 0^{o} ফা তাপমাত্রার কম মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা মেষ বা অন্য কোন প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরী পোষাক ব্যবহার করে কিন্তু ৭০^{o} ফা: উত্তাপ বিশিষ্ট মধ্য আফ্রিকার অধিবাসীরা অতি স্বল্প পোশাক ব্যবহার করে। পোষাক- এই লক্ষণীয় পার্থক্য জলবায়ুগত উপাদানের পার্থক্যের জন্যই ঘটেছে। বাক্‌ল তাঁর 'History of Civilization in England' গ্রন্থে মানুষের কার্যকলাপ পর্যালোচনায় সচেষ্ট হয়ে পারিবেশিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে পরিবেশগত প্রভাবের ফলে মানুষের বিবিধ উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে। তিনি জলবায়ু, খাদ্য ও মৃত্তিকা একটি দেশের সম্পদ একত্রিকরণের ও বন্টনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, মানুষের কার্যকলাপ প্রতিনিয়তই তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এতে প্রকাশ পেয়েছে যে সম্পদ প্রাপ্তি ও বন্টনের উপর রাশিয়া ও আফ্রিকার মাটির উর্বরতা এবং ইউরোপের জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী। অপরদিকে হ্যাকেল তাঁর 'Ecology' পুস্তকে বাক্‌ল্ এর তত্ত্ব আরও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ডেমলিন্স-এর লেখায়ও প্রকাশ পেয়েছে।

ডেমলিন্স বাক্‌ল এর পরবর্তী পরিবেশপন্থী ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর শিক্ষক ফ্রেডারিক লিপ্লে (১৮০৬-১৮৮২)-র এবং তাঁর সমসাময়িক হেনরি দ্য তুরতিল-এর ধারণাকে বিকশিত করেন। এ কাজে স্তেপভূমি পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি পরিবেশ নিমিত্তবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, স্তেপভূমির জলবায়ু তৃণভূমি বিকাশের সহায়ক হওয়ায় ঘোড়া বা বাইসন প্রাণী অধ্যুষিত ছিল। অপরদিকে এই সমস্ত প্রাণী মানুষকে যথাক্রমে গতিশীলতা ও খাদ্য সরবরাহ করে। অনেকস্থানে মেষপালন বিকাশ লাভ করে। এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ লক্ষণীয়। মধ্য এশিয়ার উদাহরণ টেনে তিনি সমাজ যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা প্রতিপন্ন করেছেন।

ফ্রেডারিক র‍্যাটজেল ও তাঁর অনুসারিরা (বিশেষ করে সেমপেল) ভূ পৃষ্ঠের জনসংখ্যার বন্টন কিভাবে প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তিনি তাঁর `Anthropogeography' পুস্তকে ব্যাখ্যা করেছেন।

সমালোচনা

প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও আলোচিত উদাহরণ সমূহের মধ্যে বহু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, একই রকম পারিবেশিক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মানব সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে পারে। পরিবেশ নি:সন্দেহে মানুষকে প্রভাবিত করলেও মানুষ তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে পারে। এই পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া এতই জটিল যে, কখন একটির শুরু এবং অপরটির শেষ তা নিরূপন করা কষ্টকর, বিশেষ করে পরিবেশগত উপাদানগুলি জনসংখ্যা বন্টনের কারণ ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। অপরদিকে, নগরের অবস্থান সব সময় পরিবেশগত উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়। সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক এমন কি আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক উপাদান নগর বিকাশে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। বর্তমান বিশ্বের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলে বহু পারিবেশিক শক্তি প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে।

সম্ভাব্যতাবাদ

সম্ভাব্যতাবাদের মূল কথা হলো প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রভাবের ক্ষেত্রে কোন কিছু নির্বাচনে মানুষের স্বাধীনতা বা পছন্দের উপর গুরুত্ব প্রদান করা। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কাঠামোর মধ্যে মানুষের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ, ব্রতী হওয়া এবং গতিময়তার ফলই হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের কর্মকান্ডের ধরণ। প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার উপর গুরুত্ব না দিয়ে মানুষের কার্যকলাপের উদ্দেশ্যের উপর সম্ভাব্যতাবাদীরা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সম্ভাব্যতাবাদীগণ মনে করেন যে, সব শেষে মানুষই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপাদানগুলি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্থান ও কাল ভেদে মানুষ নিজ পছন্দমত বিকল্প হিসাবে উপাদানগুলির যুক্তিসম্মত ব্যবহার করতে পারে - একে সম্ভাব্য নির্বাচন বলা যেতে পারে। নির্বাচনটি চূড়ান্ত হলে নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষ তা অভিযোজন (Adaptation) হিসাবে ব্যবহার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই সম্ভাব্যতাবাদ নামে পরিচিত। ভিদাল দ্য লা ব্লাশ, ব্রুনে, বোথ্যান, কার্ল-ও-সাওয়ার প্রমুখ ভূগোলবিদ আঞ্চলিক পরিচালনায় সম্ভাব্যতাবাদ মতবাদের উন্নয়ন সাধন করেছেন। ভূপৃষ্ঠের দুই বা ততোধিক অংশের সমরূপতা থাকতে পারে না। প্রত্যেক অঞ্চলের ভিন্নতর প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদির অনুপম সমন্বয় রয়েছে। এরূপ বিভিন্ন পরিবেশের আওতায় কার্যাবলীর একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মধ্যে সর্বোত্তম সম্ভাবনাটিই মানুষ বেছে নেয়।

ভিদাল দ্য লা ব্লাশ (১৮১৫-১৯১৮) প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ অস্বীকার করে তিনি তাঁর মতবাদ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে একাধিক সম্ভাবনাসমূহ (Possibilities) এবং অন্তরায়সমূহ (Limitations) প্রদান করে থাকে। তিনি এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশকে 'ভৌগোলিক পরিবেশ' বলে অভিহিত করেছেন। এই পরিবেশ সম্ভাব্যতার একটি পরিধি সরবরাহ করে, যার আওতায় মানুষ তার প্রয়োজন, ইচ্ছা এবং স্বার্থের সর্বোত্তম ব্যবহার করে। এই মতবাদ পরবর্তিতে ফরাসী ইতিহাসবিদ লুমিয়েঁ ফেবরে তাঁর 'Geographical Introduction to Histrory' গ্রন্থে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সম্ভাব্যতা' বলতে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের কর্মকান্ডের দ্বারা একটি বাঁধাধরা প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা চালিত মানুষের উদ্যম ও গতিশীলতার ফলাফলকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার অভিলব্ধ শ্রম ও সাহসিকতা এবং কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাকে ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সম্ভাব্যতাবাদীরা পার্থিব, সামগ্রীক এবং ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুর আন্ত:সম্পর্কের বিষয় বিবেচনা করে থাকে। নিমিত্তবাদীদের চেয়ে সম্ভাব্যতাবাদীরা মানুষের কাজের উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। ব্রুনে আরও উল্লেখ করেন যে, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সাথে গভীরভাবে আবদ্ধ। স্থানভেদে এবং সময়ের ব্যবধানে প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষের কার্যকলাপে বিভিন্নতা দেখা দেয়। সে তার নিয়ন্ত্রণের ক্রম বর্ধমান পন্থা দ্বারা প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই মানুষের জন্য অভ্যাসের ব্যাপার - প্রাকৃতিক বিষয়াদি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা এবং ঐ সব বিষয়ের যৌক্তিক অভিযোজনের মাধ্যমে সে সহজেই প্রাকৃতিক সীমাব্ধতা অতিক্রম করতে পারে।

মার্কিন ভূগোলবিদ বোম্যান (১৭৭৮-১৯৫০) দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে ভ্রমণ করে পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের বহু উদাহরণ লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কলম্বাসের পূর্ববর্তী ফ্রান্সে আলু, ভূট্টা, টমেটো প্রভৃতি ফসল অজ্ঞাত ছিল। কমপক্ষে দুইটি জলবায়ুর জ্ঞান ইউরোপীয় অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে কোন একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করে না। ইহা কতিপয় সুযোগ-সুবিধা দান করে এবং মানুষ সেগুলি থেকে সর্বোত্তমটি বেছে সম্ভাব্যতাবাদীরা মানুষের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তার অভ্যাস বা আচরণের উপর জোর দিয়েছেন। এই আচরণ একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তা পরিবেশের অংশে পরিণত হয় এবং তা পরবর্তী বিকাশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে মানুষের পরিবেশগত প্রত্যক্ষণও (Environmental Perception) তীক্ষ্ণ হয় এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়ক হয়।

নব্য নিমিত্তবাদ

নব্য নিমিত্তবাদ প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ অপেক্ষা অনেকটা নমনীয় মতবাদ। এখানে নিমিত্তবাদীদের নিয়েন্ত্রণের (Control) স্থলে প্রভাব (Response) বা সাড়া এবং ফলশ্রুতিতে খাপ খাওয়ানোর (Adjustment) প্রতি নব্য নিমিত্তবাদীরা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একে গ্রিফিথ টেইলর 'আস ও যাও' (Step and go) নিমিত্তবাদ নামে অভিহিত করেছেন।

তাঁর মতে মানুষ কোন দেশের উন্নয়ণকে দ্রুততর করতে, ধীর করতে বা বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত বিবেচনায় কোন দেশের উত্তম অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট অংশ প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষ যদি বিজ্ঞ হয় তবে সে অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। প্রসঙ্গতে বলা যায় যে, বন্যা প্রবণ অঞ্চলে একটি মাত্রা বা পর্যায় পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু একটি পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং গৃহিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। একইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্দেশিত পথ বিচ্যুতির ফলাফল হিসাবে গ্রীন হাউস ইফেক্টসহ বিভিন্ন মানব সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়।

নব্য নিমিত্তবাদীদের মতে মানুষ একটি নগরের যানবাহন নিয়ন্ত্রকের মত যানবাহনের সংখ্যা বা হার পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু পরিকল্পনাকে বা উন্নয়নের দিক পরিবর্তন করতে পারে না। নব্য নিমিত্তবাদী মতবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষের চাহিদাসমূহ প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। যেমন, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে পর্যাপ্ত মাছের সরবরাহ আছে সেখানে বিক্রেতা ইচ্ছা করলেই নির্দিষ্ট দামের বেশী মূল্যে মাছ বিক্রি করতে পারবে না এবং ক্রেতাও তা কিনতে চাইবে না। এখানে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমন্বয়কারী প্রকৃতি নিজেই।

পাঠসংক্ষেপ:

প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ ও সম্ভাব্যতাবাদ দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ। নিমিত্তবাদে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের আজ্ঞাবহরূপে চিত্রিত করা হয়। সম্ভাব্যতাবাদে পরিবেশগত শক্তিকে স্বীকার করে মানুষের সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, নব্য নিমিত্তবাদে মানুষ তার কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক তবে নির্দিষ্ট পরিবেশে এই নিয়ন্ত্রণের একটা সীমারেখা আছে। এই সীমারেখা অতিক্রম করা বিপর্যয়মূলক হতে পারে। আধুনিক ভূগোলে প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হয় না; বরং মানব পরিবেশ মিথষ্ক্রিয়াকে অধিকতর গুরুত্বপ্রদান করা হয়, যেখানে মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে একটা আন্ত:সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬:

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. নির্দিষ্ট মানব সংস্কৃতি পরিচালিত জ্ঞান ও জীবন যাত্রার বহি:প্রকাশ হলো -----পরিবেশ।

১.২. সংস্কৃতি এবং সামাজিক ----- মানুষের সৃষ্টি।

১.৩. মানুষের সংস্কৃতি ও ----- প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

১.৪. মুসলিম দেশসমূহে মদ ও ----- উৎপাদন না হওয়ার পেছনে রয়েছে ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধ।

১.৫. মানবজীবন ও ----- পরিবেশ একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত।

১.৬. প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ ----- শতকে বিশেষ গুরত্ব লাভ করে।

১.৭. প্রকৃতি ----- কার্যকরণ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

১.৮. প্রাকৃতিক নির্বাচন ----- মতবাদশ্রয়ী।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন:

২.১. হিপোক্রেটেস (৪২০ খৃ.পূ.) তাঁর 'On Air, Watar and Places' নামক গ্রন্থে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মধ্যে বৈপরীত্য উল্লেখ করেছেন।

২.২. এরিষ্টটল এর গ্রন্থের নাম 'Politics'।

২.৩. স্ট্রাবো রোমের উত্থান ও গৌরব স্পেনের আকৃতি ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

২.৪. বোদিন (১৬ শতক) মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, উত্তরাঞ্চলের লোকেরা পাশবিক, বর্বর, নিষ্ঠুর-নৃশংস এবং দু:সাহসিক কাজে উৎসাহী।

২.৫. মানবতাবাদী মঁতেস্কু শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ দক্ষিণের আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলের মানুষের চাইতে অধিক শক্তিশালী, সাহসী, মনখোলা, স্থিরসংকল্প এবং কামাতুর।

২.৬. ইম্যানুয়েল কান্ট এর মতে শীত প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা অতিমাত্রায় অলস ও ভীরু।

২.৭. রিটার (১৭৭৯-১৮৫৯) সর্ব প্রথম পরিবেশ সম্পর্কীয় ধারণার পরিবর্তন ঘটান।

২.৮. হামবোল্ড উপলব্ধি করেছেন যে, পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে।

২.৯. হান্টিনটন এর গ্রন্থের নাম 'Principles of Human Geogrophy'।

২.১০. বাক্‌ল এর গ্রন্থের নাম 'History of Human Civilization in England'।

২.১১. ভিদাল-দ্য-লা-ব্লাশ (১৮১৫-১৯১৮) প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ অস্বীকার করে তিনি তাঁর মতবাদ উপস্থাপন করেন।

২.১২. নব্য নিমিত্তবাদ প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ অপেক্ষা অনেকটা নমনীয় মতবাদ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. পরিবেশ কাকে বলে? পরিবেশের শ্রেণীভাগ করুন।

২. সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্টাবলী আলোচনা করুন।

৩. সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করুন।

৪. মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক বলতে কি বুঝেন?

৫. প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ মতবাদ কি?

৬. সম্ভাব্যতাবাদ মতবাদ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. সামাজিক পরিবেশ কাকে বলে? প্রাকৃতিক বনাম সামাজিক পরিবেশ বর্ণনা করুন।

২. মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত মতবাদ সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩. প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদ মতবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

৪. সম্ভাব্যতাবাদ মতবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

৫ নব্য নিমিত্তবাদ মতবাদ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-১

পাঠ-১.১

১.১. মানব, ১.২. ১৯, ১.৩. ১৮৮২, ১৮৯১, ১.৪. হেটনার।

২.১. স, ২.২. স, ২.৩. মি

পাঠ-১.২

১.১. আঞ্চলিক, ১.২. প্রাথমিক, ১.৩. ক্ষুদ্র, ১.৪. যাচাইকরণ, ১.৫. তথ্য, ১.৬. তত্ত্বের।

পাঠ-১.৩

১.১. অর্থনীতিক, ১.২. প্রাথমিক, ১.৩. মৌলিক, ১.৪. প্রাথমিক, পরিবর্ধিত, ১.৫. ভৌত, ১.৬. প্রাথমিক, ১.৭. তৃতীয়, ১.৮. চতুর্থ।

পাঠ-১.৪

১.১. ভৌগোলিক অভিধান, ১.২. স্থানে, ১.৩. স্থানিক সংগঠন, ১.৪. আচরণগত, ১.৫. সাংখ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, ১.৬. আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি।

২.১. স, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. স, ২.৫. স, ২.৬. মি, ২.৭. মি, ২.৮. স।

পাঠ-১.৫

১.১. প্রাকৃতিক, ১.২. ভৌগোলিক পরিবেশ, ১.৩. প্রাকৃতিক পরিবেশ, ১.৪. সংযোগস্থল, ১.৫. সুবিধাজনক, ১.৬. ৯০, ১.৭. প্রতিবন্ধকতা।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. মি, ২.৬. স, ২.৭. মি, ২.৮. স ২.৯. মি।

পাঠ-১.৬

১.১. সামাজিক, ১.২. ব্যবস্থাপনা, ১.৩. সমাজ, ১.৪. শুকর, ১.৫. প্রাকৃতিক, ১.৬. ১৮-১৯, ১.৭. মানুষকে, ১.৮. ডারইউনের।

২.১. মি, ২.২. স ২.৩. মি, ২.৪. স, ২.৫. স, ২.৬. মি, ২.৭. স, ২.৮. স, ২.৯. স, ২.১০. মি, ২.১১. স, ২.১২. স।